ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(সার-সংক্ষেপ)

৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা পরিচালনা

আব্দুল্লাহ্ জাহীদ ওসমানী, গবেষণা সহযোগী, পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন, টিআইবি

ড. নাবিল হক, কোঅর্ডিনেটর, পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন, টিআইবি

গবেষণা সহকারী

সুস্মিতা বড়ুয়া, *গবেষণা সহকারী, পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন, টিআইবি*

নিপুণ সরকার, *গবেষণা সহকারী, পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন, টিআইবি*

রিফাত বিন হোসেন, *গবেষণা সহকারী, পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা

বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও মতামত দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান; অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা; এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও সম্পাদনা এবং গবেষণা পরিচালনায় সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য ড. নাবিল হক, কোঅর্ডিনেটর (পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন) এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদনের উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, এনার্জি গভার্নেন্স প্রকল্পের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। গবেষণা পরিচালনায় সার্বিক সহযোগীতার জন্য পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন প্রকল্পের সহকর্মী নাজনীন আহমেদ ও মো: তারিকুল ইসলাম এবং গবেষণা সহকারীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)

বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: (+৮৮০-২)৪৮১১৩০৩২,৪৮১১৩০৩৩

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ই-বর্জ্য বলতে মূলত সেসব বাতিল ইলেকট্রনিক এবং ইলেক্ট্রিক্যাল সরঞ্জাম এবং এর যন্ত্রাংশকে বোঝায় বোঝায়, যা জীবনচক্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে (End of Life) অথবা অন্য কোন কারণে তার মালিক কর্তৃক পুনঃব্যবহারের ইচ্ছা ছাড়াই ফেলে দেওয়া হয়। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার্য সরঞ্জাম, খেলনা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার সরঞ্জাম ইত্যাদি হতে আগত বর্জ্যকে ই-বর্জ্য বা Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ই-বর্জ্যে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সীসার মতো ভারি ধাতু থাকে, এসব বিপজ্জনক উপাদান সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে। একইসাথে, এতে মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা, রুপা, প্লাটিনাম ইত্যাদি বিদ্যমান থাকায় সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ করা গেলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ই-বর্জ্যের উৎপাদন আশংকাজনক হারে বাড়ছে; ২০২২ সালে সারা বিশ্বে উৎপাদিত ই-বর্জ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬২,০০০ মিলিয়ন কেজি, যার মধ্যে মাত্র ২২.৩ শতাংশ (১৩,৮০০ বিলিয়ন কেজি) সঠিকভাবে সংগ্রহ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ এই উৎপাদনের পরিমাণ ৮২,০০০ মিলিয়ন কেজিতে পৌঁছাবে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত ই-বর্জ্যের প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরুপ, বাংলাদেশে ২০১৭ সালে ই-বর্জ্য উৎপাদন ছিল ৩১০ মিলিয়ন কেজি, যা ২০৩৫ সালে ৪,৬২০ মিলিয়ন কেজিতে পৌঁছাবে বলে বুয়েটের একটি গবেষণায় ধারণা করা হয়েছে। ২০২১ সালে এ পরিমাণ ছিল ৬০০ মিলিয়ন কেজি এবং ২০৫০ সালে তা ১০,০০০ মিলিয়ন কেজিতে পৌঁছাবে বলে অপর একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে। ২০২২ সালে Global E-Waste Monitor বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের উৎপাদন ৩৫০ মিলিয়ন কেজি হিসেবে উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তাদের জরিপের ফলাফলে দেখিয়েছে একই বছরে এই পরিমান ছিল ১৭০ মিলিয়ন কেজি। বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিপত্য বিবেচনায় এই প্রাক্কলিত পরিমাণ উদ্বেগজনক।

বুয়েটের মাধ্যমে করা পরিবেশ অধিদপ্তরের সমীক্ষা (২০১৭) অনুসারে, বাংলাদেশে মোট আনুমানিক উৎপাদিত ই-বর্জ্যের (১৩.৩ মিলিয়ন কেজি/বছর) প্রায় ৩% পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রপ্তানি করা হয়। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান তিনটি কাজ- সংগ্রহ, পুনঃব্যবহারযোগ্যকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতের মাধ্যমে করা হলেও, সংগ্রহের ৯৭ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য *ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা*, ২০২১ নামে একটি আইনি কাঠামো প্রণীত হলেও সেখানে চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আইনের প্রতিপালন এবং তাদের নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ধারনা কম। এই বিধিমালার তফসিল ২ অনুসারে, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ও সংযোজনকারী এবং বড় আমদানিকারক কর্তৃক ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে- বাস্তবায়নের ১ম বছরে (অর্থাৎ ২০২২ সালে) পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদনের ১০% করে ৫ম বছরে (২০২৬) ৫০%। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, আমদানি নীতি আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পুরনো বা পুনঃব্যবহার উপযোগী করা ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম অবৈধভাবে আমদানির ঘটনা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। এর ফলে নীতি বাস্তবায়নের ঘাটতি, তদারকি দুর্বলতা এবং জবাবদিহির অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে অপরিকল্পিত ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি ভালোভাবে গবেষণার আওতায় আসলেও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। এই গবেষণাটি টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণা, যেমন মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ জলবায়ু ও পরিবেশগত বিষয়াবলির ওপর সম্পন্ন অন্যান্য গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, যা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান নীতিগত ঘাটতি, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি এবং উত্তরণের সম্ভাব্য পথসমূহ চিহ্নিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

সামগ্রিক উদ্দেশ্য: বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ-কাঠামোর চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা।
- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য প্রযোজ্য আইনী বাধ্যবাধকতা অনুসারে প্রতিপালনের চিত্র তুলে ধরা।
- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা।

- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক তুলে ধরা।
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরন ও তথ্যের উৎসসহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নরুপ-

সারণি ১: তথ্যের উৎস

পদ্ধতি	তথ্যের উৎস/ পদ্ধতির উদ্দেশ্য
নথি পর্যালোচনা	▪ ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩, বাসেল কনভেনশন, আমদানি নীতি আদেশ, টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ▪ পিয়ার-রিভিউড প্রকাশনা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট মনিটর ডাটা
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	▪ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও গবেষক
নিবিড় সাক্ষাৎকার	▪ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সমিতি ▪ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ; বৃহৎ ই-বর্জ্য উৎপাদনকারী
পর্যবেক্ষণ	▪ আইন অনুসারে পণ্যেও গায়ে বা মোড়কে ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ তথ্যের উপস্থিতি রয়েছে কিনা
জরিপ	▪ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আইনের প্রতিপালনের অবস্থা জানা
অনলাইন জরিপ	▪ পুরনো ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভোক্তাদের জ্ঞান ও চর্চা জানা
প্রাক্কলন	▪ জলবায়ু পরিবর্তন ও ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্কের কারিগরি মূল্যায়ন

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত তথ্যদাতাদের কাছ থেকে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যদাতা হিসেবে গবেষণায় এমন অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে সরাসরি সম্পৃক্ত; যারা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ যেমন পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ কাস্টমস এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বড় ই-বর্জ্য উৎপাদক- বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক ও এনজিও; ইলেকট্রনিক সামগ্রী প্রস্তুত/ সংযোজনকারী, আমদানিকারক; ই-বর্জ্য ব্যবসায়ী ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী; সংশ্লিষ্ট সমিতি; বিশেষজ্ঞ ও গবেষক; এবং ভোক্তা।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং আইনের প্রতিপালনের অবস্থা বোঝার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের নির্দিষ্ট এলাকায় খাত সংশ্লিষ্টদের সাথে জরিপ ও পর্যবেক্ষণ; পুরনো ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং ভোক্তাদেও জ্ঞান ও চর্চা জানার জন্য একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে যেখানে ৬৭৫ জন বিভিন্ন বয়স, পেশা, অবস্থানের উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্কের একটি কারিগরি মূল্যায়ন করা হয়েছে যেখানে বুয়েটের বিশেষজ্ঞ পরামর্শকগণ সম্পৃক্ত ছিলেন।

পাশাপাশি, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেণ করা হয়েছে। পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আধেয় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নির্দেশিকা; সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন; প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি।

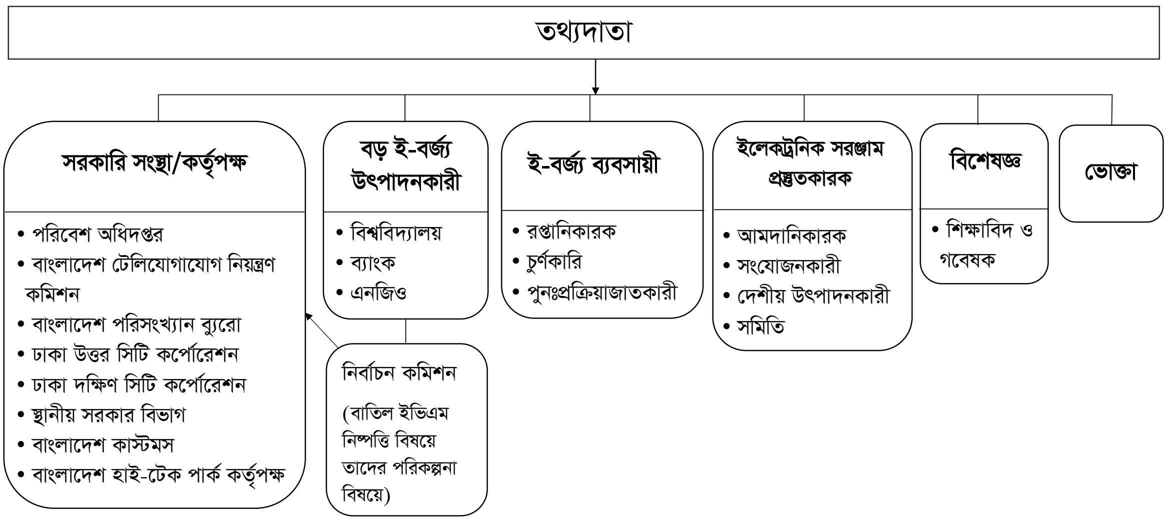

৪. বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের ছয়টি সূচকের আলোকে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ২: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র
আইন ও নীতি প্রতিপালন	▪ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা, অধ্যাদেশ; এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি
সমন্বয়	▪ সরকারী দপ্তর সমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সমন্বয়
স্বচ্ছতা	▪ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন প্রকাশ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা।
জবাবদিহি	▪ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উৎপাদন ও আমদানির তথ্যের প্রাপ্যতা ও লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি প্রতিবেদন ▪ পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ প্রক্রিয়ার পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ▪ বড় ব্যবহারকারী ভোক্তাদের ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
অনিয়ম ও দুর্নীতি	▪ পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অন্যান্য নিবন্ধন প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ▪ পুরনো ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান চর্চা; কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া
অংশগ্রহণ	▪ সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে- ○ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারীদের অংশগ্রহণ ○ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অংশগ্রহণ
নথি পর্যালোচনা	▪ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩, বাসেল কনভেনশন, আমদানি নীতি আদেশ, টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ▪ পিয়ার-রিভিউড প্রকাশনা; গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন; গ্লোবাল ই-ওয়েস্ট মনিটর ডাটা।

৫. গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় *ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা*, ২০২১ জারির পর এই খাতে বিবর্তন পরিক্রমা তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে, সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালা, আদেশ; এবং এগুলোর বলবৎকরণ ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়া এ গবেষণার আওতাভুক্ত। তবে, যেহেতু রিক্সা/ ইজিবাইকে ব্যবহৃত লেড অ্যাসিড ব্যাটারি (ULAB) পৃথক অধ্যাদেশ (SRO) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাই এ গবেষণার আওতাধীন নয়।

সময়কাল:

গবেষণার সময়কাল	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০২৫
তথ্য সংগ্রহের সময়কাল	মে - অক্টোবর, ২০২৫
অনলাইন জরিপের সময়কাল	৪ জুন - ২৬ অক্টোবর, ২০২৫

৬. গবেষণার ফলাফল

৬.১ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভোক্তাদের জ্ঞান ও চর্চা

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভোক্তাদের জ্ঞান ও চর্চা বোঝার জন্য একটি অনলাইন জরিপ পরিচালিত হয় যেখানে ৬৭৫ জন ভোক্তা অংশগ্রহণ করেন। জরিপে ৮৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে অচল ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম কীভাবে সঠিকভাবে নিস্পত্তি করতে হয় সে বিষয়ে তারা কোনো ধরনের নির্দেশনা পাননি। ফলে, ৭২ শতাংশ ভোক্তা তাদের সর্বশেষ অচল ইলেকট্রনিক পণ্যটি বাসায় ফেলে রেখেছেন।

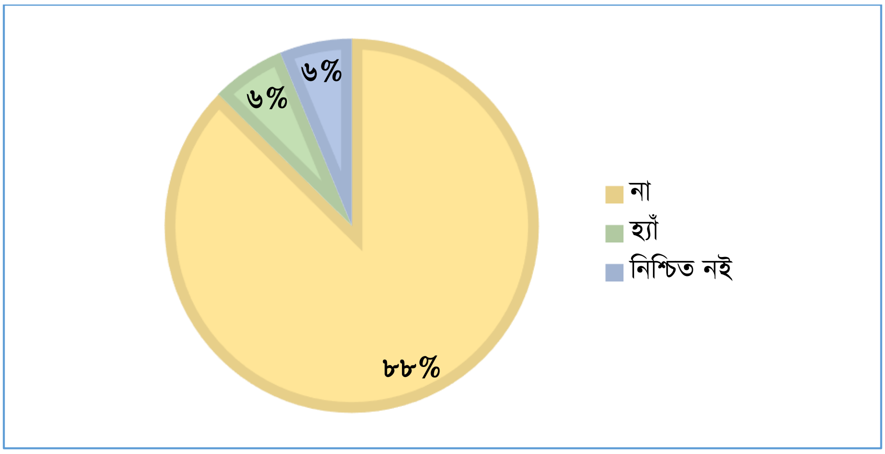

অচল ইলেকট্রনিক কীভাবে নিস্পত্তি করতে হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা পেয়েছেন কিনা

যারা সরঞ্জামটি নিস্পত্তি করেছেন (১৫%), তারা মূলত ভাঙ্গারীওয়ালার কাছে বিক্রি করেছেন, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবেশগতভাবে অনিরাপদ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চক্রকে চলমান রাখে। এসব ফলাফল ইঙ্গিত করে যে ভোক্তা পর্যায়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। একইসাথে দিক-নির্দেশনা অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ ব্যবস্থার অপ্রতুলনা লক্ষ্যণীয়।

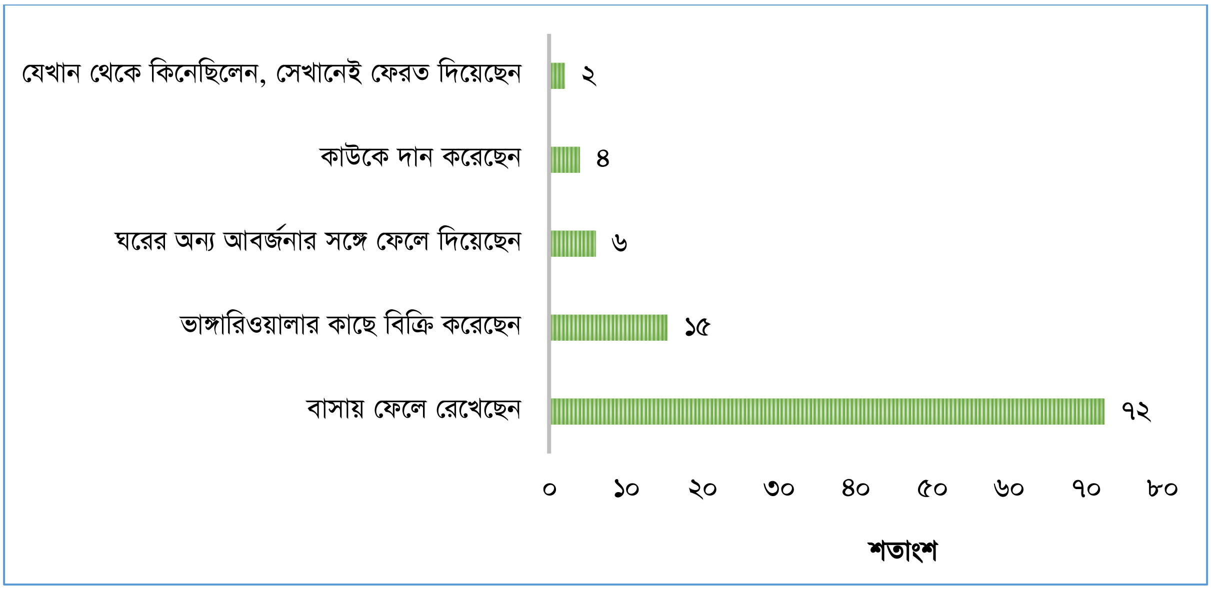

সর্বশেষ অচল ইলেকট্রনিক সরঞ্জামটি কি করেছেন

৬.২ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অংশীজনের আইনগত দায়িত্ব

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অংশীজনদের আইনগত দায়িত্বের ভিত্তিতে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সহযোগী সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রিত সত্তা। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিবন্ধন, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান, প্রতিবেদন, তথ্য ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা, ই-বর্জ্য নিষ্পত্তি ও রপ্তানির জন্য পিআইসি অনুমোদন ইত্যাদি তদারকিমূলক দায়িত্ব পালন করে; একইভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানি নিয়ন্ত্রণে কাজ করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করে। একইভাবে, স্থানীয় সরকার সংস্থা, যেমন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনসচেতনা সৃষ্টি ও ই-বর্জ্য ফেলার স্থান চিহ্নিত করার মাধ্যমে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তাদের বর্জ্য পরিসংখ্যানে ই-বর্জ্য অন্তর্ভুক্ত করে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত সত্তা হিসেবে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ী, আমদানিকারক, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দায়িত্ব অনুযায়ী সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ, পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণ, নিরাপদ নিষ্পত্তি এবং প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ও ছাড়পত্র গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালনে বাধ্য।

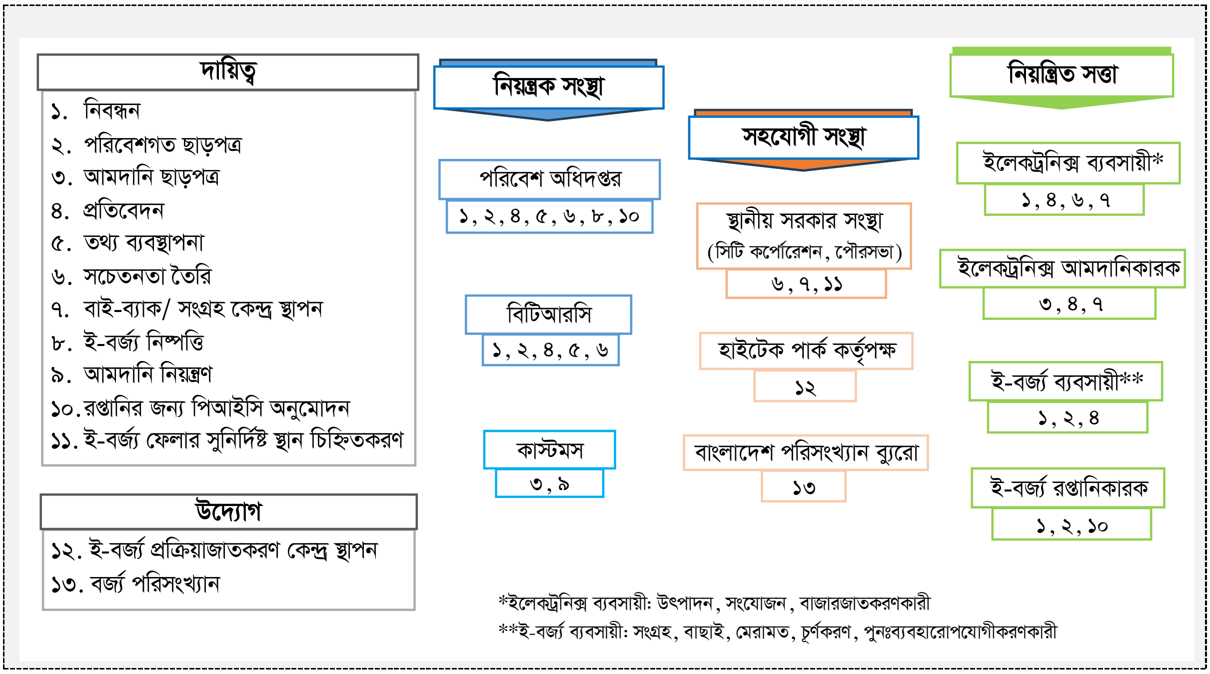

৬.৩ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

৬.৩.১ ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রথম আইনি কাঠামো যেখানে বিভিন্ন পক্ষের দায়িত্ব নির্ধারণ করলেও এর বাস্তবায়ন নগন্য। প্রস্তুতকারী ও আমদানিকারকদের সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপন, তহবিল গঠন, লেবেলিং ও সচেতনতা কার্যক্রমের কোনোটিই বাস্তবায়ন হয়নি; ভোক্তারা ই-বর্জ্য জমাদান বা ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত নয়। নিবন্ধন, পরিবেশগত ছাড়পত্র ও তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশনাও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পালন করেনি, আর পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকি ও তথ্য প্রকাশ অপর্যাপ্ত। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ই-বর্জ্য ফেলার নির্দিষ্ট স্থানও চিহ্নিত করতে পারেনি। তফসিল ২ এ নির্ধারিত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুপস্থিত, এবং খসড়ায় থাকা উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) বাদ পড়ায় জবাবদিহিতা আরও দুর্বল হয়েছে। সব মিলিয়ে বিধিমালা থাকলেও বাস্তবায়ন ঘাটতি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

সারণি ৩: ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এ বর্ণিত বিধান/ দায়িত্ব প্রতিপালনে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ

বিধি	যার উপর প্রযোজ্য	বিধান/দায়িত্ব	প্রতিপালনের ঘাটতি
বিধি ৩	ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুত বা সংযোজন, আমদানি, বাজারজাতকরণ খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	• ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করা বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা এবং মেরামতকারী, চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারযোগ্যকারী বরাবর সরবরাহ • ই-বর্জ্য রাখার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা সমন্বিতভাবে সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন এবং ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা • ই-বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা এবং নিবন্ধিত সংগ্রহ কেন্দ্রের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল ইত্যাদি পণ্যের/ মোড়কের গায়ে উল্লেখ অথবা ভোক্তা ও বড় ব্যবহারকারী ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ • বিপদজনক উপাদান ও পুনঃব্যবহাযোগ্য না করা করার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি	• এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ই-বর্জ্য সংগ্রহকেন্দ্র স্থাপিত হয়নি • ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা যৌথ উদ্যোগে কোন তহবিল গঠন করা হয়নি • পণ্যের গায়ে/ মোড়কের গায়ে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি • বিপজ্জনক উপাদান ও পুনঃব্যবহারযোগ্য না করার ঝুঁকি সম্পর্কিত কোনো ধরনের সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি
বিধি ৭	ব্যক্তিগত ভোক্তা বা বড় ব্যবহারকারী ভোক্তা	• ই-বর্জ্য কোনো নির্দিষ্ট মজুদকারী বা কোনো সংগ্রহ কেন্দ্রের নিকট জমা প্রদান। • ই-বর্জ্য নিলামে বিক্রি করা বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী, সংগ্রহ কেন্দ্র, মেরামতকারী, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারযোগ্যকারীর বা মেরামত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতকারকের নিকট জমা প্রদান	• এ বিষয়ে ভোক্তাদের অবহিত করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি • ই-বর্জ্য নিষ্পত্তির দিক-নির্দেশনার অভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়বদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না
বিধি ১০, ১২, ১৬	ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি	• ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী, বড় আমদানিকারক, ব্যবসায়ী, মজুদকারী, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারযোগ্যকারী, রপ্তানিকারককে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে • নিবন্ধন গ্রহণকারীকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর অধীন পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে • ফরম-৬ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও ফরম-৭ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করবে	• এখন পর্যন্ত মাত্র ৭টি প্রতিষ্ঠান পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী হিসেবে নিবন্ধন গ্রহণ করেছে • ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকরণ, আমদানি-রপ্তানি, বাজারজাতকরণ খাতে জড়িত কোনো প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন নেয়নি • নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ফরম-৬ অনুসারে ই-বর্জ্যের তথ্য সংরক্ষণ করে না এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ফরম-৭ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ ও প্রতিপালন সুনিশ্চিত করে না

বিধি	যার উপর প্রযোজ্য	বিধান/দায়িত্ব	আইনের ঘাটতি	প্রতিপালনের ঘাটতি
বিধি ১০	পরিবেশ অধিদপ্তর	• অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণসহ এ সংক্রান্ত তথ্য এবং নিবন্ধনপ্রাপ্তগণের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রকাশ করবেন	• একজন কর্মকর্তার পক্ষে ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়	• তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অধিদপ্তরে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই • নিবন্ধনপ্রাপ্তগণের তালিকা প্রকাশ করা হয় না
বিধি ২৩	সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান	• সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ গৃহস্থালি বর্জ্য ফেলার স্থানে ই-বর্জ্য ফেলার স্থান চিহ্নিত করবে • পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তদারকি করবে • ই-বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেওয়ার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করবে	• ই-বর্জ্য ফেলার স্থান চিহ্নিত করার পর সেগুলোর কী হবে তা বলা হয়নি • কোন ই-বর্জ্যগুলো বিধি ২৩ এর আওতায় পড়বে আর কোনগুলো বিধি ৭ এর আওতায় উৎপাদকরা সংগ্রহ করবে তা উল্লেখ করা হয়নি • এসব কাজে কীভাবে সমন্বয় হবে তার নির্দেশনা নেই	• ই-বর্জ্য ফেলার কোনো স্থান চিহ্নিত করা হয়নি • তদারকি ব্যবস্থা ও জনসচেতনতা তৈরির কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি
তফসিল ২	ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী, সংযোজনকারী, আমদানিকারক	• ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, এই বিধিমালা বাস্তবায়নের ১ম বছরে পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদনের ১০% করে, ৫ম বছরে ৫০%	**প্রতিপালনের ঘাটতি** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের রূপরেখা প্রণয়ন বা অগ্রগতির তথ্য সংরক্ষণ, কোনোটিই করা হয়নি	

৬.৩.২ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফশিল ১ এ বাণিজ্যিকভাবে ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে কমলা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এই শ্রেণিবিন্যাসের যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্পষ্ট নয়, বিশেষ করে যখন পূর্ববর্তী পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ এটি লাল শ্রেণিভুক্ত ছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১-এ ব্যবসায়ী, মজুদকারী, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারযোগ্যকারী, নিলাম বিক্রেতা এবং রপ্তানিকারকসহ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পক্ষকে চিহ্নিত করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এ কেবলমাত্র *পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী* শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। ফলে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কোন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক এবং কারা এ থেকে অব্যাহতি পাবে তা অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে। এভাবে দুই বিধিমালার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস ও বাধ্যবাধকতার অসঙ্গতি সৃষ্টি হওয়ায় ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং পরিবেশগত জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

৬.৩.৩ টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২২

টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০২২ এর নির্দেশনা ৫ অনুসারে টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসহ টেলিকম যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী ও আমদানিকারককে টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিংয়ের লক্ষ্যে সংলগ্নি-১ অনুযায়ী বিটিআরসি হতে অনুমোদন গ্রহণ এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। একই সাথে, তাদের ব্যবহৃত, উৎপাদিত ও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে পুরনো, ব্যবহৃত ও অকেজো যন্ত্রপাতি/ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সংলগ্নি-২ অনুযায়ী কমিশনের

অনুমতি নিতে হবে। বিটিআরসি এর নিকট অনুমোদন গ্রহণ ও কার্যক্রমের প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছেও অনুমোদন ও প্রতিবেদন প্রদান করতে হয়, যা অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি তৈরি করে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিটিআরসির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি চালানের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আলাদা ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়, যা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠান ও তদারককারী সংস্থা উভয়ের জন্যই অতিরিক্ত সময়, ব্যয় এবং প্রশাসনিক জটিলতা বাড়ায়। একইভাবে, টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী বা আমদানিকারকদের পুরাতন, ব্যবহৃত বা অকেজো যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিটিআরসি থেকে সংলগ্নি-২ অনুযায়ী অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনুমোদনপ্রাপ্ত ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকেই পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। ফলে অনুমোদন ও ছাড়পত্র ব্যবস্থার এই বহুপক্ষীয় ও জটিল কাঠামো টেলিকম খাতে কার্যকর ও পরিবেশসম্মত ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

৬.৩.৪ বিপদজনক বর্জ্যের আমদানি-রপ্তানি এবং নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বাসেল কনভেনশন, ১৯৯২

বাসেল কনভেনশন, ১৯৯২ অনুযায়ী বিপদজনক বর্জ্যের আমদানি, রপ্তানি এবং নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাক্ষরকারী দেশসমূহকে পূর্ব-অবহিত সম্মতি (পিআইসি) প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ই-বর্জ্যও এই পিআইসি প্রক্রিয়ার আওতায় এসেছে। যেহেতু বাংলাদেশ এই প্রক্রিয়ার প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে অসম্মতি জানায়নি, তাই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমর্থিত হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বাস্তবে বাংলাদেশে পিআইসি সরাসরি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়, যার ফলে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই অনুমোদনের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, পিআইসি অনুমোদন না নিয়ে বা অনুমোদিত পরিমাণের অতিরিক্ত রপ্তানি করলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার কোন নির্দেশনা নেই। এ অবস্থায় বিপদজনক ই-বর্জ্যের রপ্তানি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে।

৬.৩.৫ আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪

আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর পরিশিষ্ট ১ এ উল্লিখিত আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা অনুসারে সকল আমদানিকারকের জন্য রিকন্ডিশন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট, পুরাতন কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী আমদানি নিষিদ্ধ। এছাড়া, একই তালিকার দফা-১০ অনুযায়ী, যদি ভিন্নরূপ বিধান না থাকে, তবে সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ আমদানি নিষিদ্ধ। তবে বাস্তবে, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। পুরনো বা পুনঃব্যবহারযোগ্য করা ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম শনাক্ত করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায়, এই ধরনের পণ্য অবাধে আমদানি করা হচ্ছে, যা প্রশাসনিক ঘাটতি এবং নিয়ন্ত্রণের অসঙ্গতির জ্বলন্ত উদাহরণ।

৬.৩.৬ প্রাসঙ্গিক আইন, নীতি ও আদেশ, বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারে সামঞ্জস্যহীনতা

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতি, বিধিমালা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। ই-বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার পর (*ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১;* বিধি ২৩) কীভাবে পরিবেশবান্ধব ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে তার কোনো নির্দেশনা নেই। একইভাবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে কীভাবে পরিবেশবান্ধব ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আওতায় আনা যেতে পারে তার কোনো দিক-নির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনা নেই। ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক ও সংযোজনকারী এবং বড় আমদানিকারক কর্তৃক ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তার জন্য কোনো উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) নির্দেশিকা নেই; এই বিধিমালার খসড়ায় ইপিআর এর উল্লেখ থাকলেও চূড়ান্ত সংস্করণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার কয়েকটি বিধিতে প্রণোদনা (বিধি-৩ঞ) এবং জরিমানা (বিধি-২১) ও দন্ড (বিধি-২৪) সম্পর্কে অস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও কীভাবে সেগুলো বলবৎ করা হবে তা বলা হয়নি। একইভাবে, ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার কাজে নিয়োজিতদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশিকা নেই, এটি কেবল একটি বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে- *চূর্ণকারীর দায়িত্ব হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণকে ই-বর্জ্যের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে অবহিতকরণ (বিধি-৮ঞ)।*

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালায় রপ্তানির শর্তাবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। অন্যদিকে, রপ্তানি নীতি আদেশ ২০২৪-২০২৭-এও ই-বর্জ্য রপ্তানির বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। আবার, বাসেল কনভেনশন নিষেধাজ্ঞা সংশোধনীতে যেকোনো বিপদনক উপাদানের আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এমনকি যদি তা পুনঃব্যবহারযোগ্য করা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার উদ্দেশ্যেও করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও এই সংশোধনী অনুমোদন করেনি এবং এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো পরিকল্পনা নেই। এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত নিলামের জন্য কোনো একক নির্দেশিকা নেই। ২০২২ সালে একটি *Draft Assets Disposal*

Policy প্রণয়ন করা হলেও তা অদ্যাবধি চূড়ান্ত হয়নি। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এই পলিসির আলোকে তাদের নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি কোনো নিলাম এবং সম্পদ নিষ্পত্তির নীতিমালা ই-বর্জ্য বিবেচনা করে হালনাগাদ করা হয়নি। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা বিপুল সংখ্যক ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কীভাবে বিধি অনুসারে নিষ্পত্তি করা যায় তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনো পরিকল্পনা বা তাদের কাছে কোনো নির্দেশনা নেই। একইভাবে, ব্যাংকের এটিএম নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও বিশেষায়িত নীতিমালা নেই।

এমনকি বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০২০-এর মধ্যেও এ সংক্রান্ত বিধি রাখা হয়নি। পুরনো ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম আমদানি নিষিদ্ধ হলেও জাহাজ ভাঙা শিল্প থেকে আসা পুরনো ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বিক্রয় বা ব্যবহার বিষয়ে ই-বর্জ্য বিধিমালা, ২০২১ ও আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪-এ কোনো নির্দেশনা নেই।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প থেকে আসা ইলেকট্রিকাল সরঞ্জাম বাজারে বিক্রি হচ্ছে

জাহাজের তারের প্লাস্টিক কাভার আলাদা করা হচ্ছে

ই-বর্জ্য বিধিমালায় বৈদ্যুতিক গাড়ি, সোলার প্যানেল, ব্যাটারি চালিত খেলনা, ড্রোন ইত্যাদি তালিকাভুক্ত করা হয়নি, এবং এসব থেকে সৃষ্ট ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনো পরিকল্পনা নেই। বিধিমালায় প্রণোদনা, জরিমানা ও দণ্ডের বিষয়ে অস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সেগুলো কীভাবে বলবৎ করা হবে তা বলা হয়নি। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশিকা কেবল একটি বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের জন্য অপর্যাপ্ত।

ই-বর্জ্য বিধিমালায় বৈদ্যুতিক গাড়ি, সোলার প্যানেল, ব্যাটারি চালিত খেলনা, ড্রোন ইত্যাদি তালিকাভুক্ত করা হয়নি এবং এধরনের ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম হতে প্রাপ্ত ই-বর্জ্য কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে তার উল্লেখ নেই। খসড়া বৈদ্যুতিক যানবাহন শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৫-এ শুধু ব্যাটারি নিষ্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বৈদ্যুতিক যানবাহন থেকে সৃষ্ট অন্যান্য ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। অথচ, উক্ত নীতিমালাতেই (৬.১) বলা হয়েছে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সরকারি যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০% বৈদ্যুতিক যানবাহন ক্রয় করার নির্দেশনা প্রদান করা হবে। এছাড়াও, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদানে (এনডিসি-৩) ২০৩৫ সালের মধ্যে মোট ব্যবহৃত যাত্রীবাহী যানবাহনের ৩০% বৈদ্যুতিক যানবাহন হওয়ার নিঃশর্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অসঙ্গতিগুলো ইঙ্গিত করে যে নীতি ও বিধিমালার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

৬.৪ সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ

পরিবেশ অধিদপ্তরে আন্তঃশাখা সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান, যেখানে নিবন্ধন, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতিগত দিকনির্দেশনা দায়িত্ব *বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখার* হলেও নিয়ন্ত্রণ ও বলবৎকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে *মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা*। ফলে নীতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটি কাঠামোগত বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। টেলিকম ই-বর্জ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিটিআরসি ও পরিবেশ অধিদপ্তর উভয় সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হওয়ায় একই কার্যক্রমে দ্বৈততা সৃষ্টি হয়, এবং এই কার্যক্রম তদারকিতে একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হওয়ায় প্রক্রিয়াটি আরও জটিল হয়ে পড়ে। উভয় সংস্থায় সভা অনুষ্ঠানে দীর্ঘসূত্রতা, এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সময় মেলানো কঠিন হওয়ায় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় ফলে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয় বেড়ে যায়। অপরদিকে, একাধিক সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি গ্রহণ ও প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা প্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারীর জন্য বাড়তি বোঝা। যার ফলে তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ই-বর্জ্য ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য করার সক্ষমতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে না।

২০২১-২০২৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা

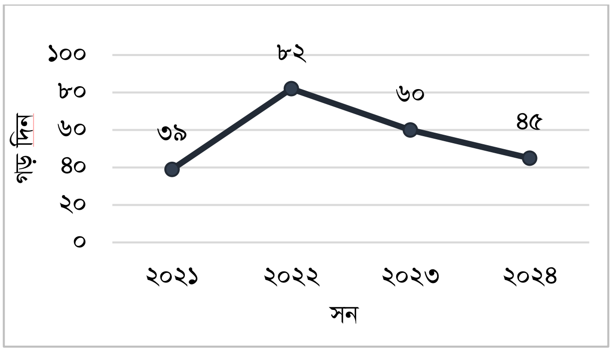

এই সময়কালে অনুষ্ঠিত সভার মধ্যে দিন সংখ্যার গড় ব্যবধান

পরিবেশ অধিদপ্তর রপ্তানির অনুমোদনপত্র (পিআইসি) সরাসরি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করায় কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই অনুমোদনের সত্যতা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের অভাব এবং স্বচ্ছতার ঘাটতিকে স্পষ্ট করে। তাছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পিআইসি অনুমোদনের জন্য সভা আয়োজনেও উল্লেখযোগ্য দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্য করা যায়, ফলে রপ্তানি কার্যক্রম অযথা বিলম্বিত হয়।

২০২২-২০২৪ সময়কালে প্রদত্ত পিআইসি'র জন্য সভার সংখ্যা

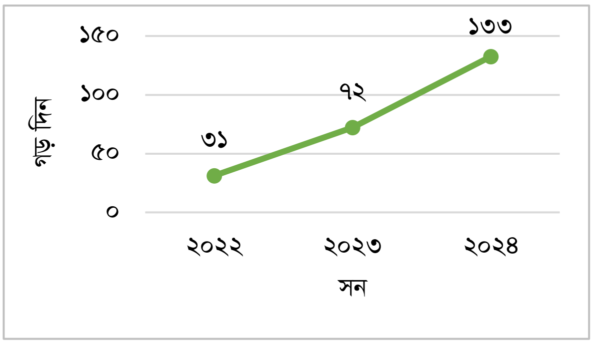

এই সময়কালে অনুষ্ঠিত সভার মধ্যে দিন সংখ্যার গড় ব্যবধান

আরও বড় সমস্যা হলো, নিবন্ধন ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭। বিটিআরসিতে এ সংখ্যা ১৪, এর মধ্যে ৭ টি উভয় সংস্থায় নিবন্ধিত হলেও বাকি ৭টি পরিবেশ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত না হয়েই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই দ্বৈত ও অসম্পূর্ণ নিবন্ধন ব্যবস্থা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তদারকির ঘাটতি সৃষ্টি করছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ আরও তীব্র করে তুলছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) মধ্যে কোনো সমন্বিত ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা নেই। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে ই-বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো এখনো বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে *বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ* যে ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় না থাকায় পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে কার্যকর সংযোগ ও দায়িত্ব বণ্টন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এই ধরনের অন্তঃ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা শুধু নীতি বাস্তবায়নকে ধীর করে না, বরং একটি টেকসই ও কার্যকর ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে ওঠার পথে বড় বাধা সৃষ্টি করছে।

৬.৫ স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

তথ্য প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিটিআরসি কোনো সংস্থাই নিবন্ধিত ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে ভোক্তা বা বড় ব্যবহারকারী ভোক্তা কার কাছে ই-বর্জ্য জমা দেবে সেই তথ্য উন্মুক্ত নয়। ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণসহ এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। ফলে কী পরিমাণ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয় তার তথ্যও প্রকাশ করা হয় না। একইভাবে, পরিবেশ অধিদপ্তর ই-বর্জ্য বিধিমালা লঙ্ঘনের কারণে কী ধরনের দন্ড ও কী পরিমাণ জরিমানা আরোপ করে, তার তথ্য প্রকাশ করে না। তদুপরি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুত বা সংযোজন, আমদানি, বাজারজাতকরণ খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের পণ্যের পরিমাণ ও পুনঃব্যবহারযোগ্য করা ই-বর্জ্যের তথ্য প্রকাশ করে না ফলে, কী পরিমাণ পুনঃব্যবহারযোগ্য করতে হবে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, যা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। পাশাপাশি, তথ্য ব্যবস্থাপনার কোনো সমন্বিত ব্যবস্থা না থাকায় জাহাজ ভাঙা শিল্প থেকে আসা পুরনো ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এবং ই-বর্জ্যের তথ্য একত্রিত করা সম্ভব হয় না।

৬.৬ জবাবদিহির চ্যালেঞ্জ

৬.৬.১ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুত বা সংযোজন ও বড় আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পরিবেশ অধিদপ্তর এখনো এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিবন্ধনের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, ফলে তারা ভোক্তাদের কাছ থেকে তাদের পণ্য হতে সৃষ্ট যে ই-বর্জ্য ফেরত নেওয়া এবং সেগুলো পুনঃব্যবহারযোগ্য করা বা পরিবেশসম্মত উপায়ে নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি দায়বদ্ধ, তা প্রতিপালন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানগুলো ই-বর্জ্য সংগ্রহ করছে কিনা বা এর উদ্দেশ্য কী–তা পর্যবেক্ষণের জন্য কোনো নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা নেই। কিছু প্রতিষ্ঠান 'বাই-ব্যাক' অফার চালু করলেও তা মূলত বিক্রয় বৃদ্ধির বিপণন কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পরিবেশসম্মত আ-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে নয়। ভোক্তা পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ৮ টি ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ইলেট্রনিক পণ্য বিক্রয়ের শোরুমে সরাসরি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কয়েকটির ক্ষেত্রে এ অফার প্রদান করা হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাই-ব্যাক অফার প্রদান করা হয় না।

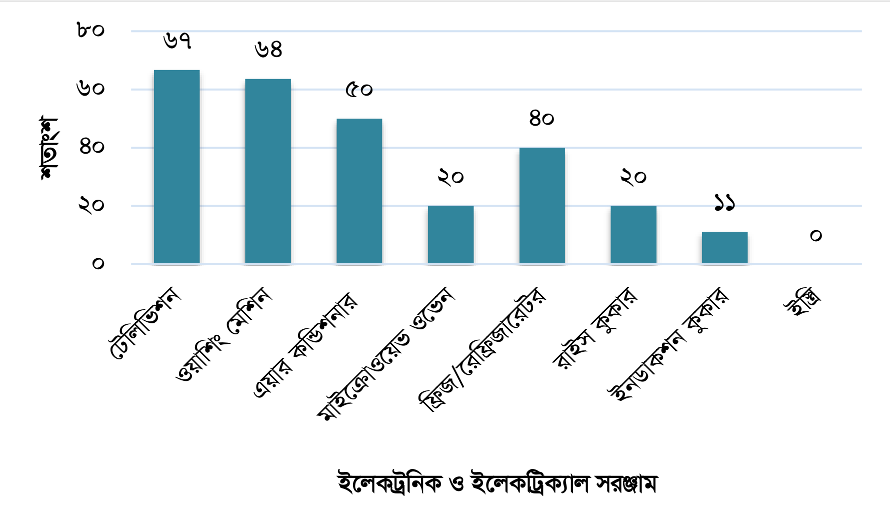

ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ভিত্তিক বাই-ব্যাক অফারের শতকরা হার

অনুরুপভাবে, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভোক্তাদেও সাথে অনলাইন জরিপে দেখা যায় ৭৩ শতাংশ ভোক্তা তাদের অচল ইলেকট্রনিক পণ্য নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বাই-ব্যাক অফার পাননি। এ ছাড়াও একই পর্যবেক্ষণের আওতায় দেখা যায়, পণ্যের গায়ে বা মোড়কে বিপদজনক উপাদানের তথ্য উল্লেখ করা হয় না, ফলে এসব পণ্যের পরিবেশগত ঝুঁকি মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

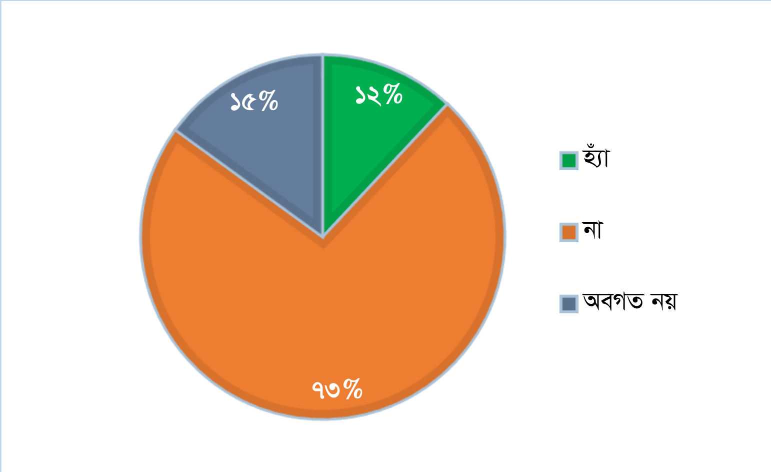

ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাই-ব্যাক অফারের শতকরা হার

৬.৬.২ ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করার তথ্য ও লক্ষমাত্রা অর্জনের তথ্য প্রকাশ

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের ঘাটতি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিদ্যমান। বর্তমানে কী পরিমাণ ই-বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে তার কোনো তথ্যভান্ডার (Inventory) নেই। একইভাবে, এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে তারও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এই তথ্যের অভাবে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালার তফসিল ২ অনুসারে ই-বর্জ্য সংগ্রহের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জন হচ্ছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়না এবং সেই তথ্য প্রকাশ করা হয় না।

৬.৬.৩ ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করার প্রক্রিয়ার পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করার পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণে, বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি বিদ্যমান পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান বিধিমালার আওতায় এ খাতের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ বা মূল্যায়ন করে না, ফলে পুনঃব্যবহারযোগ্য করার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সম্ভাব্য দূষণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক চিত্র অজানা থেকে যায়। তাদের ভাষ্যমতে, *"আমরা কঠোর নই কারণ ভাঙ্গারিওয়ালারা ই-বর্জ্য ল্যান্ডফিল পর্যন্ত পৌঁছতে না দিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখেন"।*

৬.৬.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রাধান্য

ই-বর্জ্য সংগ্রহ, বাছাই ও চূর্ণকরণ এবং মজুদকরণের সিংহভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ভাঙ্গারিওয়ালারা করে থাকে, অথচ তাদের জবাবদিহি ব্যবস্থার আওতায় আনার কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। কাগজ ও প্লাস্টিকের মতো অন্যান্য ফেলে দেওয়া গৃহস্থালি জিনিসপত্রের সাথে মিশ্রিত করে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত জড়িত শ্রমিকরা বিপদজনক পদার্থের সংস্পর্শে আসায় তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তদারকির অভাবে পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি হয়।

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ জারির চার বছর পরেও দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ভাঙ্গারিওয়ালারা প্রথমত ই-বর্জ্য সংগ্রহ, দ্বিতীয়ত পৃথককরণের সাথে জড়িত, এবং কেবল কিছু ভাঙ্গারিওয়ালা সরাসরি চূর্ণকরণের সাথে জড়িত। প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃব্যবহারযোগ্যকারী সহ অন্যান্য পণ্য ব্যবসায়ীরা ভাঙ্গারিওয়ালাদের কাছে থেকে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করেন। ভাঙ্গারিওয়ালাদের সংগ্রহ করা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি) পাইকারি ক্রেতাদের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হয় কিন্তু কোন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে নজরদারি নেই।

সারণি ৪: অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবসার নিবন্ধনের চিত্র

নিবন্ধন/ সনদের ধরন	নিবন্ধন/ সনদ সংখ্যা	উত্তরদাতা সংখ্যা	মন্তব্য
শুধু ট্রেড লাইসেন্স	১ টি	৪৭	৮৪ টি ব্যবসার মধ্যে ৭৬ টির (৯০.৫%) কোন না কোন নিবন্ধন বা সনদ রয়েছে
ট্রেড লাইসেন্স + TIN	২ টি	২৭	
ট্রেড লাইসেন্স + TIN + BIN	৩ টি	২	
কোনো নিবন্ধন/ সনদ নেই	০ টি	৮	

এই গবেষণার আওতায় পরিচালিত জরিপ ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা জারির চার বছর পরও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃব্যবহারযোগ্যকারী সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ভাঙ্গারিওয়ালাদের কাছ থেকে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করে, এ থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি এবং এর বিস্তৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও ধারণা করা হয় যে অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবসায়ীরা (ভাঙ্গারিওয়ালা) নিবন্ধিত নয়, তবে এই গবেষণায় ৮৪ টি ভাঙ্গারি ব্যবসার সাথে গুণগত জরিপে দেখা যায়, এদও মধ্যে ৭৬ টিরই ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে এবং অনেকের ট্যাক্স সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) ও ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর (BIN) রয়েছে। এ থেকে বলা যায়, অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবসা পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতার বাইরে থাকলেও এরা আসলে একবারে অপ্রাতিষ্ঠানিক নয়, যেহেতু তাদের কোনো না কোনো নিবন্ধন রয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকি কার্যক্রমের আওতার বাইরে থাকায় তাদের কার্যক্রমে কোনো নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি নেই। একইসাথে দেখা যায়, এরা নিবন্ধন ছাড়াই কেবল ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ই-বর্জ্য নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারে।

পরিবেশ অধিদপ্তর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তদারকি করে না - ফলে দেখা যাচ্ছে, ভাঙ্গারিওয়ালারা বিধিমালায় প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে জানে না এবং সেগুলো মেনে চলে না। যেমন, বিধি ৬ অনুযায়ী পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ই-বর্জ্য সংগ্রহ ও নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব সংগ্রহকারীদের ওপর অর্পিত, ভাঙ্গারিওয়ালারা তা অনুসরণ করেন না। একইভাবে, বিধি ৮ অনুযায়ী চূর্ণকারীদের নিবন্ধন ও ছাড়পত্র নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে চূর্ণকরণ, পৃথককরণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, অনিবন্ধিত হওয়ায় ভাঙ্গারিওয়ালারা এ নিয়ম মানে না এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার আওতার বাইরে থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করে। মজুদ সংক্রান্ত বিধি ১৩ তে উল্লিখিত পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি অবলম্বন ও পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রাখা, ই-বর্জ্য যাতে মাটি, পানি বা বায়ুর সাথে সংমিশ্রিত না হয় তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও বাস্তবে ভাঙ্গারিওয়ালারা এসব মানে না, ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এর সঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যকর তদারকির অভাব যুক্ত হয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণহীন ও দায়মুক্ত অবস্থায় পরিচালিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, যা নীতিমালা বাস্তবায়নে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এই ছবিতে ভাঙ্গারি দোকানের একজন শ্রমিককে খালি হাতে ইলেকট্রিক ফিউজ চূর্ণ করতে দেখা যাচ্ছে যা স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ

ভাঙ্গারি দোকানের সামনে খোলা অবস্থায় বৈদ্যুতিক তারসহ অন্যান্য ই-বর্জ্য ফেলে রাখতে দেখা যাচ্ছে, এতে পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে

৬.৭ অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

৬.৭.১ নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা প্রণয়নের সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে পরামর্শ করা হয়নি, ফলে নীতিমালায় তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চাহিদা প্রতিফলিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ই-বর্জ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুত, আমদানি, বাজারজাতকরণ খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা ছাড়াই ই-বর্জ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি করেছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবসার গড় বয়স প্রায় ১৫ বছর হলেও তাদের অস্তিত্ব ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালায় প্রতিফলিত হয়নি এবং তাদের কার্যক্রম তদারকির কোনো ব্যবস্থাও নেই। তাদের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো নীতি নির্ধারকদের আলোচনার টেবিলে তাদের জায়গা না থাকা এবং এ খাত নিয়ে সরকারের কোনো পরিকল্পনা বা আর্থিক বরাদ্দ না থাকা।

৬.৭.২ নারীর অন্তর্ভুক্তি

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। তারা কেবল বাছাই ও চূর্ণকরণ কাজে নিয়োজিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নেই। অপরদিকে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায় না। নারীর সীমিত অংশগ্রহণের পেছনে প্রধানত তিনটি বিষয় কাজ করে। প্রথমত, সমাজে এখনো একটি ধারণা প্রচলিত যে নারীরা এ ধরনের কাজের জন্য শারীরিকভাবে যথেষ্ট সক্ষম নন। দ্বিতীয়ত, ঘরের বাইরে নারীদের কাজ করা নিয়ে অনেকের মধ্যে নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা তাদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে। তৃতীয়ত, নিরাপত্তা শঙ্কা ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশের অভাব নারীদের এই কাজে যুক্ত হতে আরও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য সামাজিক ও পারিবারিক কারণও নারীর অংশগ্রহণকে সীমিত করে। সার্বিকভাবে, এসব সামাজিক বিশ্বাস, লিঙ্গভিত্তিক ধ্যানধারণা ও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগই নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে দেখা যায়।

সারণি ৫: অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের কারণ

নারীর সীমিত অংশগ্রহণের কারণ	ঢাকা (n=৪২)	চট্টগ্রাম (n=৩৮)	মোট (n=৮০)
নারীরা এ কাজের জন্য শারীরিকভাবে সক্ষম নয় বলে মনে করা	১৫	২১	৩৬
নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করার প্রতি নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	১৭	৮	২৫
নারীর নিরাপত্তা শঙ্কা / কাজের পরিবেশ নেই বলে মনে করা	৮	৭	১৫
অন্যান্য	২	২	৪

৬.৮ অনিয়ম ও দুর্নীতি

৬.৮.১ পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অন্যান্য নিবন্ধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন

প্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্যকারীদের অনেকেই নিবন্ধন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ করেছেন। ভাঙ্গারিওয়ালারাও লাইসেন্স পেতে অথবা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের ঘটনা জানিয়েছেন।

৬.৮.২ নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ই-বর্জ্য উপাদান রপ্তানির ক্ষেত্রে অনিয়ম

ই-বর্জ্য রপ্তানি ক্ষেত্রেও অনিয়মের চিত্র সুস্পষ্ট। সকলের নজর এড়িয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কিছু পাইকারি ব্যবসায়ী কোনো নজরদারি ছাড়াই প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি) সহ বিভিন্ন ই-বর্জ্য উপাদান বিদেশে রপ্তানি করছে, যা বাসেল কনভেনশনের আওতায় পিআইসি অনুমোদন ব্যবস্থার পরিপন্থী। নিবন্ধিত কয়েকটি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠান বাসেল কনভেনশনের অধীনে পিআইসি অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি ই-বর্জ্য উপাদান রপ্তানি করছে। যা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর তদারকি দুর্বলতার পাশাপাশি সম্ভাব্য দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার অভাবকে প্রতিফলিত করে।

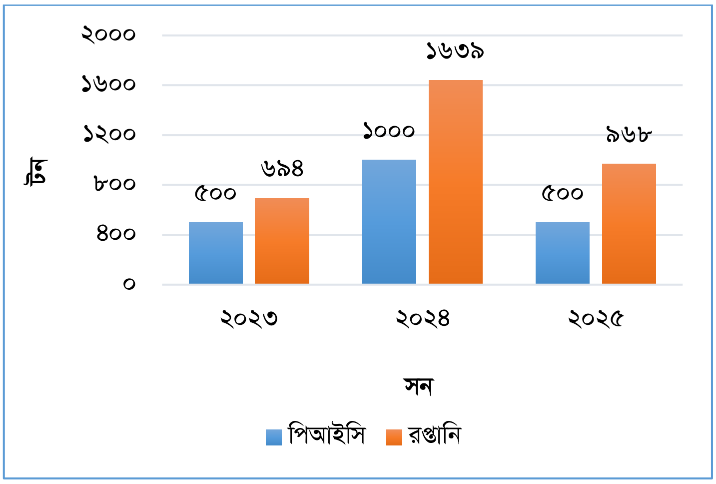

সবচেয়ে বড় ই-বর্জ্য রপ্তানিকারক কর্তৃক পিআইসি অনুমোদনের চেয়ে বেশি রপ্তানির চিত্র

৬.৮.৩ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ই-বর্জ্য আমদানি

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এবং আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ উপেক্ষা করে পুনঃব্যবহারযোগ্য করা ও পুরাতন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম আমদানি করা হচ্ছে। কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী (HS Code-85491100-85499900), ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা প্রণয়নের পরও বিগত তিন বছরে (২০২২-২০২৪) সাত লাখ ডলার মূল্যের ই-বর্জ্য উপাদান আমদানি করা হয়েছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন ধরনের ই-বর্জ্য আমদানির পরিমাণ ১৪,৯৮৫ টন, যা রপ্তানিকৃত ই-বর্জ্য উপাদানের (৪,০৪০ টন পিসিবি ও স্ক্র্যাপ) চেয়ে বেশি।

বিভিন্ন খাতে ব্যবহারের জন্য এসব ই-বর্জ্য উপাদান আমদানি করা হয়েছে-

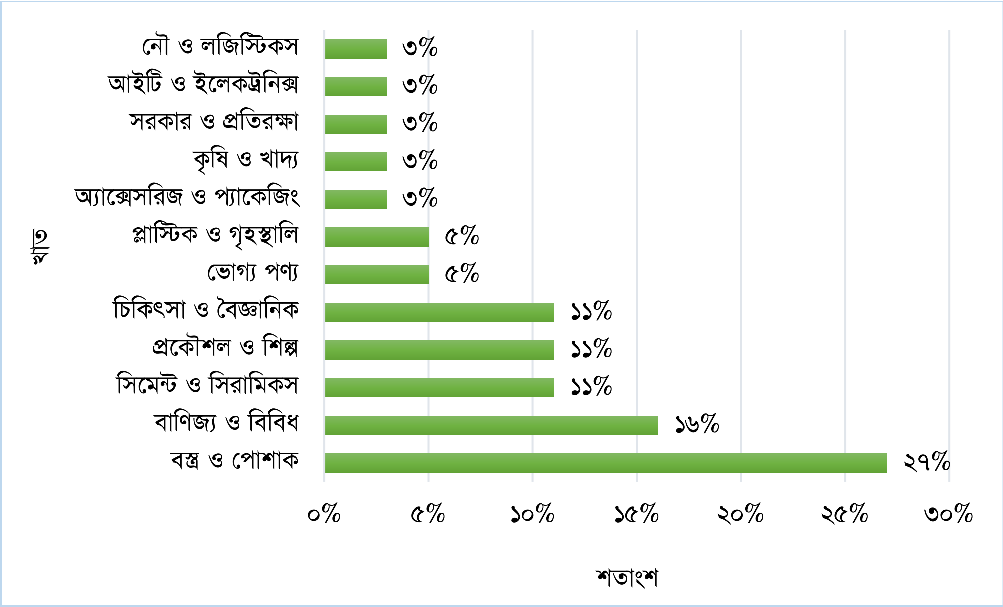

বিভিন্ন খাতে ই-বর্জ্য আমদানির চিত্র

নিয়মবহির্ভূত আমদানি-রপ্তানির এই চিত্র শুধু আইনি কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে না, বরং পরিবেশগত ঝুঁকি, রাজস্ব ক্ষতি এবং সুশাসন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৮. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক

৮.১ জলবায়ু পরিবর্তনে ই-বর্জ্যের অবদান

ই-বর্জ্য শুধু পরিবেশ দূষণই নয়, জলবায়ু পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতেও ভূমিকা রাখে। ই-বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে কার্বন-সমৃদ্ধ গ্যাস নির্গত হয়, যা গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। একইভাবে, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনারের অনিরাপদ নিষ্পত্তির ফলে হাইড্রোক্লোরোফ্লুরোকার্বন (HCFC) গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে। এই গ্যাসগুলো শুধু গ্রিনহাউস প্রভাব বাড়ায় না, বরং ওজোন স্তর ক্ষয়ের জন্যও দায়ী, যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ায়।

রাস্তার পাশে রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম ফেলে রাখা ও খুলতে দেখা যাচ্ছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে কম্প্রেশার কেটে পুনঃব্যবহারযোগ্য করতে দেখা যাচ্ছে, এতে এইচসিএফসি গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

৮.২ জলবায়ু প্রশমনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি উদ্ভূত ই-বর্জ্য

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো দীর্ঘমেয়াদে ই-বর্জ্যের নতুন উৎস তৈরি করছে, যা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান চ্যালেঞ্জ। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যে সোলার প্যানেলের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ গবেষণার আওতায় প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২৫ থেকে ২০৬০ সালের মধ্যে সোলার প্যানেল হতে আনুমানিক ৫.৫ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্যে তৈরি হবে। একইভাবে, বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে; গত ২০২২-২০২৫ অর্থবছরে ১৬,৭২৪ টি ইলেকট্রিক যানবাহন (EV) আমদানি করা হয়েছে। তবে, এসব যানবাহনের আকার ও গঠন সম্পর্কিত তথ্য একত্রিত না হওয়ায় ভবিষ্যতে কী পরিমাণ ই-বর্জ্যে পরিণত হবে তা প্রাক্কলন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতি ইঙ্গিত করে যে জলবায়ু প্রশমনমূলক প্রযুক্তি একদিকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে সহায়ক হলেও অন্যদিকে ই-বর্জ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলছে।

৮.৩ ই-বর্জ্য উৎপাদনে জলবায়ু সৃষ্ট দুর্যোগের অবদান

জলবায়ু সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে বন্যার ফলে ই-বর্জ্য উৎপাদন হতে পারে। বন্যার সময় গৃহস্থালির অনেক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা ই-বর্জ্যের একটি বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের Federal Emergency Management Agency (FEMA) এর Hazus মডেল ব্যবহার করে দেখা যায়, যদি বন্যার গড় গভীরতা ৭০ সে.মি. হয়, তাহলে গৃহস্থালি জিনিসপত্রের প্রায় ৩৫% পর্যন্ত ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে। এর থেকে প্রাক্কলন করা যায় যে, ২০২২ সালের বন্যায় বাংলাদেশে প্রায় ২৪,০১৩ টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছিল। দুর্যোগ সৃষ্ট এই বিপুল পরিমাণ ই-বর্জ্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে কোনো কার্যকর দুর্যোগ পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রটোকল নেই। ফলে, সঠিক সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না।

৮.৪ যথাযথ ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করার মাধ্যমে মূল্যবান ধাতুর জন্য খনির উপর নির্ভরশীলতা ও আমদানি-রপ্তানি নির্ভরশীলতা কমার সম্ভাবনা

যথাযথ ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করার মাধ্যমে মূল্যবান ধাতুর আহরণ বৃদ্ধি পেলে খনির উপর নির্ভরশীলতা এবং আমদানি-রপ্তানি নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। ঢাকার অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্যের হটস্পট থেকে প্রতিবছর প্রায় ১,১৭৩ টন ই-বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। যদি এই ই-বর্জ্য সঠিকভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা যায় তাহলে প্রায় ৩১ টন তামা আহরণ করা সম্ভব, যা থেকে বর্তমান বাজার দরে বার্ষিক ৩৫ মিলিয়ন টাকারও বেশি আয় করা সম্ভব। সুতরাং, কার্যকর পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণ কেবল অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করে না, বরং খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং দেশে ধাতব উপাদানের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৯. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর, কাস্টমস) ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ বাস্তবায়নে জোর দিচ্ছেন না। পাশাপাশি, বিদ্যমান বিধিমালার পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত নয়, এবং এতে উল্লিখিত লক্ষ্য পূরণ ও এর বাস্তবায়ন করা হয়নি। তথ্যের ঘাটতির কারণে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কতটুকু তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে, অপ্রাতিষ্ঠানিক ই-বর্জ্য ব্যবসা পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতার বাইরে থাকলেও এরা প্রকৃতপক্ষে অপ্রাতিষ্ঠানিক নয়। ২০২১ সালে বিধিমালা প্রণীত হওয়ার পরও অদ্যাবধি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে তদারকির আওতায় আনতে না পারা জবাবদিহির ঘাটতিকে স্পষ্ট করে। আবার, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও আমদানি নীতি আদেশ অনুসারে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, ই-বর্জ্য এবং পুরাতন ইলেকট্রনিক্স আমদানি অব্যাহত থাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার পরিচয় দেয়। সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও আমদানি নীতি আদেশ অনুসারে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, ই-বর্জ্য এবং পুরাতন ইলেকট্রনিক্স আমদানি অব্যাহত থাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার পরিচয় দেয়। এছাড়া, পরিবেশ অধিদপ্তর ই-বর্জ্য বিধিমালার অধীনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যেমন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে দায়বদ্ধ করতে অক্ষম। একইসাথে, ই-বর্জ্য বিধিমালা অংগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রণীত না হওয়ায় এর বাস্তবায়ন বিভিন্ন সমস্যা দ্বারা বাধাগ্রস্ত। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, অংশীজনদের মধ্যে সমঝোতার অভাব, অবাস্তব প্রত্যাশা এবং এমন সব বিধি যাতে বাস্তবতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাই ই-বর্জ্য বিধিমালায় সংশোধন প্রয়োজন। একইসাথে, সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা এবং বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনাও জরুরী।

১০. সুপারিশ

১. কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ সংশোধন করতে হবে-

- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালার তফসিল ১-এ ই-বর্জ্য শ্রেণীবিভাগের আওতা (বৈদ্যুতিক যানবাহন, সোলার প্যানেল ইত্যাদির মতো ক্রমবর্ধমান সরঞ্জাম যুক্ত করে) সম্প্রসারণ এবং সময়ে সময়ে এ তালিকা হালনাগাদ
- বিধিমালা কার্যকর করার জন্য প্রণোদনা এবং জরিমানা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারা সংযোজন
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর অনুরূপ একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের জন্য বিধি যুক্ত করা
- ই-বর্জ্য রপ্তানির শর্তাবলি ও শাস্তির বিধানসহ নির্দিষ্ট বিধি সংযোজন

২. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কারিগরি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে-

- কীভাবে পুনঃব্যবহারযোগ্য করার স্থানে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে
- নিবন্ধন এবং ছাড়পত্র পেতে অপ্রাতিষ্ঠানিক পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণকারীদের কি কি শর্ত মানতে হবে
- ই-বর্জ্যে থাকা ক্ষতিকর উপাদান কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী
- দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ই-বর্জ্য কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে সেই পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ণনাসহ একটি *দুর্যোগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রটোকল*

৩. ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রস্তুত বা সংযোজন, আমদানি, বাজারজাতকরণ খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক একটি ইপিআর গাইডলাইন তৈরি করতে হবে। যেখানে নিশ্চিত করতে হবে-

- ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের রূপরেখা, যেমন কোন কোন ইলেকট্রনিক পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথমে ইপিআর কার্যকর করা হবে
- প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি অর্গানাইজেশনের (পিআরও) জন্য ই-বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তহবিলের ব্যবস্থা

৪. জাতিসংঘের ই-বর্জ্য পরিসংখ্যানের নীতিমালা অনুসরণ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নেতৃত্বে ই-বর্জ্যের একটি তথ্যভান্ডার (Inventory) তৈরি করতে হবে

৫. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা (ভাঙ্গারিওয়ালাদের) আওতাভুক্ত করার জন্য একটি পথনকশা তৈরি করতে হবে

৬. ই-বর্জ্য ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স এর একটি পৃথক শ্রেণিবিভাগ তৈরি করতে হবে, যাতে সহজে তাদের চিহ্নিত করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকির আওতায় আনা যায়

৭. ই-বর্জ্য আমদানি-রপ্তানি এবং পুরনো ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাস্টমস বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে

৮. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে একটি বিশেষায়িত ই-বর্জ্য নিষ্পত্তি নীতিমালা (E-Waste Disposal Policy) প্রণয়ন করতে হবে, যা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে

৯. *খসড়া ইলেকট্রিক ভেহিকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা*, ২০২৫-এ বৈদ্যুতিক যানবাহন থেকে সৃষ্ট ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (ইপিআর) নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে

১০. পরিবেশ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

১১. ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা বলবৎকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিবন্ধন ও প্রতিবেদন দাখিল প্রক্রিয়া অটোমেশনের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে

১২. পরিবেশ অধিদপ্তর, বিটিআরসি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সহ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সকল অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় পদ্ধতি ঠিক করতে হবে